ইসলাম ও পুজিবাদ

মুহাম্মাদ কুতুব

ইসলামী দুনিয়ায় নয়, বরং ইউরোপেই পুঁজিবাদের জন্ম। এটা ছিল মেশিন আমদানীর প্রত্যক্ষ ফল। আর ঘটনাক্রমে মেশিন আবিষ্কৃত হয় ইউরোপে এবং সেখান থেকেই এটা দুনিয়ার অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

ইসলাম কি পুঁজিবাদের সমর্থক?

ইসলামী দুনিয়া যখন পুঁজিবাদের সাথে পরিচিত হয় তখন পর্যন্ত পুঁজিবাদ ইউরোপের বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠে। অন্যদিকে ইসলামী দুনিয়ার দুর্ভাগ্য ও পতন তখন আসন্ন। এবং তার সর্বত্রই মূর্খতা, দরিদ্রতা ও অধোগতির আলামত একেবারে স্পষ্ট। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আগমনের ফলে ইসলামী দুনিয়ায় কিছু বস্তুগত উন্নতি সাধিত হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর প্রতি লক্ষ্য করে অনেকেই এরূপ ভুল ধারণা পোষণ করেছে যে, ইসলাম পুঁজিবাদের সমর্থক এবং পুঁজিবাদের বর্তমান ত্রুটিসহ এটাকে নিজেদের মনে করতে কোন আপত্তি করে না। কেননা পুঁজিবাদের সাথে ইসলামের কোন মুলনীতি ও মৌলিক মালিকানার অধিকার দেয় তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম পুঁজিবাদের পরিপন্থী নয়। বস্তুত এ হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে এক জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা অপবাদ এর উত্তরে পুঁজিবাদের সমর্থকদের নিকট বলতে চাই: পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সুদী কারবার ও ইজারাদারীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইসলাম এর প্রত্যেকটিরই ঘোর বিরোধী। এবং আজ থেকে শত সহস্র বছর পূর্বে ইসলাম এটাকে হারাম ও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। শুধু একথাটিই ইসলাম এবং পুঁজিবাদের মৌলিক পার্থক্য বিশ্লেষণ করার জন্যে যথেষ্ট।

যদি ইসলামী দুনিয়ায় মেশিন আবিষ্কৃত হত

আসুন একবার সমীক্ষা নিয়ে দেখা যাক, যদি ইসলামী দুনিয়ায় মেশিন আবিষ্কৃত হতো এবং এর ফলে যে অর্থনৈতিক প্রগতি ও স্বাচ্ছন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হতো সে সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভংগী কি হতো এবং শ্রম ও উৎপাদনের শৃংখলা বিধানের জন্যে কোন্ ধরনের নিয়ম-কানুন রচনা করা হতো?

[illegible]

সকল অর্থনীতি বিশারদ এ বিষয়ে একমত, এমনকি পুঁজিবাদের মহাশত্রু কার্লমার্কসও একথা সমর্থন করেন যে, প্রাথমিক যুগে সকল মানুষই পুঁজিবাদ দ্বারা বহু উপকৃত হয়েছে, গোটা দুনিয়া তার মাধ্যমে উন্নতি ও সমৃদ্ধির নব নব মঞ্জিলের সাথে পরিচিত হয়েছে, উৎপাদন ও ফসল বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, জাতীয় মাধ্যমসমূহের প্রচলন ব্যাপক হয়ে উঠেছে এবং শ্রমিক ও মজুরদের জীবনযাপনের মান আগের চেয়ে-যখন তার একমাত্র ভিত্তি ছিল চাষাবাদ –বহুগণ উন্নত হয়েছে।

অধ:পতনের সূচনা

কিন্তু পুঁজিবাদের এই যুগ শীঘ্রই শেষ হয়ে যায়। কেননা তার স্বাভাবিক উন্নতির আড়ালে ক্রমে ক্রমে সকলের সম্পদ কয়েকজন পুঁজিবাদীর হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে উঠে এবং গরীব, কৃষক ও শ্রমিকরা উক্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এতে করে শ্রমিক সংগ্রহ করা পুঁজিপতিদের জন্যে খুব সহজ হয়ে পড়ে এবং তাদের মেহনতের ফলে তাদের সম্পদ ও বাণিজ্যে অকল্পনীয় উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু তাই বলে তারা শ্রমিক বৃদ্ধি করতে আদৌ সম্মত হয়নি। অথচ তাদের পারিশ্রমিক এত কম ছিল যে, ন্যূনতম মানসম্পন্ন জীবনযাপনও তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাদের মেহনতের ফলে যে মুনাফা হতো তা তাদের মুনিবরা হস্তগত করতো এবং

নিজেদের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জন্যে দু'হাতে খরচ করত।

পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক কুফল

শ্রমিকদের এই নামমাত্র পারিশ্রমিক প্রদানের একটি ফল হলো এই যে, পুঁজিবাদী দেশসসূহের অধিবাসীদের ক্রয় ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং তাদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী স্তুপ আকারে জমা হতে থাকে। এ কারণে পুঁজিপতিরা তাদের মাল বিক্রির নতুন নতুন বাজার সন্ধান করতে থাকে। এই সন্ধানের ফলেই একদিন উপনিবেশবাদ বাজার সৃষ্টি এবং কাঁচামাল সংগ্রহের তাগিতে আন্তর্জাতিক দাসত্বের দ্বার উন্মোচিত হয়। আর পরিশেষে যুক্তিসংগত কারণেই মানবতা বিধ্বংসী মহাযুদ্ধের সূচনা হয়।

স্থায়ী মন্দা বাজার

এ কারণেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই মন্দা বাজারের আশংকায় ভোগে। অপর্যাপ্ত পারিশ্রমিক এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিপক্ষে চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে এই মন্দাভাব দেখা দেয়। বস্তুত এক একটি স্বল্পকালীন বিরতির পরেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এরূপ স্থায়ী সংকটে পতিত হয়।

খোড়া যুক্তি

কিছু সংখ্যক বস্তুবাদী লেখক বলছে: পুঁজিবাদের এই খারাপ দিকগুলো পুঁরিই স্বাভাবিক পরিণতি। পুঁজির সাথে এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পুঁজিপতিদের বদ মতলব বা লুঠপাঠের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই যুক্তিটি এত খোড়া যে একে মেনে নিলে একথাও স্বীকার করেনিতে হয় যে, চিন্তা ও প্রেরণার যত শক্তিই থাক না কেন, মানুষ তার অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাসতব ঘটনাবলীর হাতে নিছক খেলনার পুতুল মাত্র।

ইসলামের নীতি : সমান মুনাফা

পুঁজিবাদের প্রাথমিক যুগে তা দ্বারা মানুষ যে উপকৃত হয়েছে, যে বস্তুগত উন্নতি ও সচ্ছলতা লাভ করেছে, ইসলাম তার কোনটিকেই অস্বীকার করে না এবং কোনটির বিরোধিতাও করে না। কিন্তু ইসলামী দুনিয়ায় উহা আবির্ভূত হলে ইসলাম উহাকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দিত না; বরং তার জন্যে এমন আইন-কানুন রচনা করতো যাতে করে শোষণ বা 'এক্সপ্লয়েটেশান'-এর কোন অবকাশ থাকত না। পুঁজিপতিদের কোন মতলব বা পুঁজি নিয়োগের কোন বৈশিষ্ট্যই একে রুদ্ধ করতে পারত না। ইসলাম এই পর্যায়ে যে মূলনীতি আমাদেরকে দিয়েছে তার আলোকে মালিকের ন্যায় শ্রমিকরাও মুনাফার সমান অংশীদার; কেননা উক্ত মুনাফায় পুঁজির হিসসা যতটুকু বর্তমান, মেহনতের হিসসাও ততটুকু বর্তমান।

ইসলামী আইনের এই ধারায় একথা সুস্পষ্ট যে, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যে কতদূর তৎপর তা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ কোন বস্তুগত প্রয়োজন, কোন বাধ্যবাধকতা কিংবা কোন শ্রেণী সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসেবে গৃহীত হয়নি, বরং এটি ছিল তার আভ্যন্তরীণ মানসিক বিপ্লবের স্বাভাবিক ফল।

প্রাথমিক যুগে যাবতীয় শিল্প ও কারিগরী ছিল একান্তই সহজ ও সরল। এবং শ্রমিকরা হাতেই কারতো বেশীর ভাগ কাজ। ইসলামের উপরোক্ত নীতির আলোকে পুঁজি ও মেহনতের পারস্পরিক সম্পর্ককে যদি মজবুত করে তোলা হতো তাহলে এমন একটি ন্যায়বিচার ভিত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি হতো যাতে করে ইউরোপের তথাকথিত পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক কুফলগুলো কখনো পরিদৃষ্ট হতো না।

সুদী ব্যাংক এবং ঋণ

অর্থনীতি বিশারদদের মতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন প্রাথমিক "উৎকৃষ্ট যুগঃ থেকে বর্তমান "নিকৃষ্ট যুগঃ পদার্পণ করে তখন থেকে জাতীয় ঋণদানই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হলো। ব্যাংক মালিকরা অর্থনৈতিক কার্যক্রম এমনভাবে

বিন্যস্ত করলো যে, তারা সুদ গ্রহণ করে সরকারকে ঋণ দিতে শুরু করে। ব্যাংক কার্যক্রমের অর্থনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক জটিলতার দিকে না গিয়ে পাঠকদের সমীপে আমরা এতটুকু বলতে চাই যে, এই ঋণদান এবং ব্যাংকের অধিকাংশ কার্যক্রমই সুদের ভিত্তিতে চলছে। অথচ ইসলাম এই সুদকে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।

পুঁজিবাদের দ্বিতীয় ভিত্তি

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা। এর ফলে ছোট ছোট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় কিংবা এগুলো একত্র হয়ে পড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করে। এখান থেকেই ইজারাদারী (Monopoly) অস্তিত্বলাভ করে। কিন্তু ইসলাম ইজারাদারীরও ঘোর বিরোধী। হযরত বিশ্বনবী (স) এরশাদ করেন:

"যে ইজারাদারী কায়েম করে সে পাপী।"

–(মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী)

এই হলো পুঁজিবাদের দু'টি প্রধান ভিত্তি। ইসলাম নীতিগতভাবেই এর উভয়টির বিরোধী। এরপর ইসলাম ও পুঁবিজাদ যে এক নয় এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য ইসলামের আওতায় যদি পুঁজিবাদের উদ্ভব হতো তাহলে উহারবর্তমান "নিকৃষ্ট যুগের" দোষগুলো কখনো সৃষ্টি হতো না এবং পুঁজিবাদের অন্যায় শোষণ, ঘৃণ্য উপনিবেশবাদ এবং ধ্বংসাত্মক যুদ্ধও কোনদিন সংঘটিত হতো না।

ইসলামী দুনিয়া শিল্প বিপ্লব হলে

ইসলাম কী রূপে স্বাগত জানাবে

ইসলামী দুনিয়ায় শিল্প বিপ্লব হলে তাকে নিজের রঙে রঞ্জিত করতে আদৌ কোন অসুবিধা হতো না। তা শিল্প ও কারিগরীকে ছোট ছোট কারখানা পর্যন্ত –যে গুলোর মুনাফা মালিক ও শ্রমিকরা আপোষে বন্টন করে নিত –সীমাবদ্ধ করে রাখর জন্যে জোর দিত না। ফলে উৎপাদনের মাত্রা বহুল পরিমাণে বেড়ে যেত। অথচ মালিক ও শ্রমিকের সেই ধরনের সম্পর্ক কোন দিন গোচরীভূত হতো না যা ঊনিশ ও বিশ শতকের ইউরোপে (এক অভিশাপ রূপে) বিরাজমান। তার পরিবর্তে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এমন নীতির ভিত্তিতে নির্ণীত হতো যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি –যা যাবতীয় মুনাফাকে মালিকও শ্রমিকের মধ্যে সমান হারে বন্টন করার নির্দেশ দেয়।

এই ইসলামী নীতি অনুসরণ করার পর সুদ ও মওজুদদারী বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং শ্রমিকরাও সেই বে-ইনসাফী, দরিদ্রতা ও লাঞ্ছনার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে যা ইউরোপের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এক নির্মম বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিত।

সমাজতান্ত্রিক দাবীর প্রতিবাদ

ইসলাম সম্পর্কে ধারণা করা হয়: বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শ্রেণী সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক চাপের মুখে সমাজতান্ত্রিক আইন-কানুন যেমন পরিবর্তন এসেছে ঠিক তেমনি করে ইসলামের সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আইন-কানুনেরও আপনা আপনি বিভিন্ন সংস্কার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভিত্তিহীন ও নির্বুদ্ধিতামূলক। পূর্বেই আমরা প্রমাণ করেছি, দাসপ্রথা, সামন্তবাদ এবং প্রাথমিক পুঁজিবাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানে ইসলাম কীরূপে তার শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করেছে। ইসলাম যে সর্বাত্মক সংস্কার সাধন করেছে তার কোনটার পেছনেই কোন বাইরের চাপ বর্তমান ছিল না; বরং তার পশ্চাতে সক্রিয় ছিল ইসলামের অমোঘ নীতি ও শাশ্বত সুবিচার। সমাজতন্ত্রী লেখকরা ইসলামী নীতির কঠোর সমালোচনা করে থাকে। অথচ বাস্তব ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের আদর্শ সমাজতান্ত্রিক (!) দেশ রাশিয়া সমান্তবাদী যুগ অতিক্রম করার পর ধনতান্ত্রিক যুগ

অতিক্রম না করেই সরাসরি সমাজতান্ত্রিক যুগে প্রবেশ করেছে। অন্য কথায়, যে রাশিয়া কার্লমার্ক্সের দর্শনের একনিষ্ঠ প্রচারক তা বাস্তব কাজের মাধ্যমেই তার এ দর্শনকে অস্বীকার করেছে যে, প্রতিটি মানবসমাজকেই তাদের উন্নতির যুগে অবশ্যই নির্ধারিত যুগগুলোকে অতিক্রম করতে হবে।

ইসলাম ও উপনিবেশবাদ

উপনিবেশবাদী ব্যবস্থা, যুদ্ধ, অন্যান্য জাতির শোষণ এবং পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম তার ঘোর বিরোধী; নিজের উপনিবেশ স্থাপন কিংবা অন্য লোকদেরকে নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও ইসলাম পসন্দ করে না। ইসলাম শুধু এক প্রকার যুদ্ধেরই অনুমতি দেয়। আর তাহলো : জুলূম ও আক্রমণের বিরুদ্ধে কিংবা আল্লাহর কালেমা প্রতিষ্ঠার পথে শান্তিপূর্ণ মাধ্যমসমূহ ব্যর্থ হয়ে গেলে।

একটি ভিত্তিহীন ধারণা

সমাজতন্ত্রীও তাদের সমমনা লোকদের মতে উপনিবেশবাদ মানুষের উন্নতির একটি অপরিহার্য স্তর। একটি নিছক অর্থনৈতিক ব্যাপার হিসেবেই এটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহের উদ্বৃত্ত প ণ্য সামগ্রী দেশের বাইরে বাজারজাত করণের জন্যে এটা ছিল অপরিহার্য। সুতরাং কোন নৈতিক মতাদর্শ অথবা কোন নীতিমালাই এর সৃষ্টির পথ যেমন বন্ধ করতে পারে না। তেমনি এর হাত থেকে নিষ্কৃতিও লাভ করতে পারে না।

একটি প্রশ্ন

এখানে এ সত্যের পুনরাবৃত্তি একেবারেই নিষ্প্রয়োজন যে, মানুষের উন্নতির জন্যে উপনিবেশবাদকে একটি অপরিহার্য স্তর হিসেবে গণ্য করার অলীক কল্পনাকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। সমাজস্ত্রীরা এই দাবীও করে থাকে যে, শ্রমিকদের ডিউটির সময় কমিয়ে দিয়ে এবং উৎপন্ন দ্রব্যে তাদের অংশ বৃদ্ধি করে রাশিয়া তার উদ্বৃত্ত পণ্যের সুষ্ঠূ সমাধান করতে সক্ষম হবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া যদি এরূপে উদ্বৃত্ত পণ্য সমস্যার সমাধান করতে পারে না? সুতরাং উপনিবেশবাদের স্তর অতিক্রম করা কেমন করে অপরিহার্য বলে গণ্য হতে পারে?

একটি পুরানো সমস্যা

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, উপনিবেশবাদ মানবীয় প্রকৃতির একটি চিরন্তন দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। এর সূচনা পুঁজিবাদের প্রভাবে হয়নি –যদিও আধুনিক মরণাস্ত্রে সুসজ্জিত পুঁজিপতিরা এসে এর রক্তচোষা স্বভাবকে সহস্রগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। নির্যাতিত ও পরাভূত জাতিগুলোর উপর শোষণের যে স্টীম রোলার চালানো হচ্ছে তাতে একথাই সুস্পষ্ট যে প্রাচীন যুগের রোমীয় উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ আধুনিক ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় কোন দিক থেকেই পেছনে ছিল না।

ইসলাম ও অন্যায় শোষণ

ইতিহাস আরো সাক্ষ্য দেয় যে, যুদ্ধের দিক থেকে ইসলাম বিশ্বের বুকে সবচে' পবিত্র ব্যবস্থা। যুদ্ধের ফল স্বরূপ কখনো কোন জাতিকে শোষণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং কারুর উপর দাসত্বও চাপিয়ে দেয়া হয়নি। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী দুনিয়ায় শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হলে ইসলাম উদ্বৃত্ত উৎপাদন সমস্যা (Problem of Surplus Production) এমন শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতো যাতে করে যুদ্ধ অথবা উপনিবেশবাদ কোনটারই প্রয়োজন অনুভূত হতো না। বাস্তব ঘটনা এই যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদন সমস্যা পুঁজিবাদের মৌলিক নীতিকেই যদি বদলে দেয়া যায় তাহলে উদ্বৃত্ত উৎপাদনের কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না।

সম্পদের কুক্ষিগত করণ ও ইসলাম

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদের কুক্ষিগত করণ পর্যায়ে সরকার একেবারেই নীরব ও অসহায়। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় সরকার এ ব্যাপারে অসহায় বা নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা পালন করে না; বরং সরকারই এমন নিশ্চয়তা প্রদান করে যাতে করে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে কোন ব্যক্তি বা পরিবারের কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে এবং তার ফলস্বরূপ গোটা দেশবাসী দারিদ্র ও বঞ্চনার নির্মম শিকারে পরিণত না হয়। এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া ইসলামী শরীয়তের কাম্য নয়। কেননা উহা চায় যে, দেশের সমস্ত সম্পদ অবর্তিত হয়ে যেন গুটিকতক ব্যক্তি হাতে পুঞ্জিভূত হয়ে না উঠে; বরং সমস্ত সম্পদ এমনভাবে ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে যাতে করে সমস্ত জনসাধারণ উপকৃত হতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকদের দায়িত্ব হলো: কাউকে কষ্ট না দিয়ে কিংবা কারুর উপর জুলূম না করে ইসলামী আইন বাস্তবায়িত করা। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহর নির্ধারিত গণ্ডির ভেতর অবস্থান করে সরকারকে প্রভূত ক্ষমতা দান করা হয়েছে যাতে করে আল্লাহর আইনকে পুরোপুরিভাবেই প্রবর্তিত করতে সক্ষম হয় এবং তার ফলস্বরূপ দেশের সম্পদ গুটিকতক লোকের হাতেই আবদ্ধ হয়ে থাকার সুযোগ না হয়। ইসলামের দায়ভাগ সংক্রান্ত আইনই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ আইনের লক্ষ্য হলো: একটি পুরুষ যত ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করবে উহা পরবর্তী পুরুষেরে লোকদের মধ্যে একটি সমীচীন পন্থায় বন্টিত হতে থাকবে। যাকাতের অবস্থাও অনুরূপ। যাকাতে ধনীদের বার্ষিক আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ দরিদ্র লোকদের কল্যাণ ও সমদ্ধির জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু ইসলাম পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সম্পদ সঞ্চয়কে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এবং সম্পদ সঞ্চয়েল মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত সুদকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছে। এখানেই শেষ নয়, ইসলাম সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ককে পারস্পরিক শোষণের পরিবর্তে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত করে দিয়েছে।

মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার নিশ্চয়তা প্রদান

প্রসংগত স্মরণীয় যে, বিশ্বনী (স)-এর এরশাদ অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রকেই সমস্ত কর্মচারীর মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব পালনক করতে হয়। হযরত নবী (স) এরশাদ করেন:

> "যে ব্যীক্ত আমাদের (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের) কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে সে অবিবাহিত হলে বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে। তার থাকার ঘর না থাকলে, ঘরের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। চাকর না থাকলে চাকর দিতে হবে। সওয়ারীর জন্যে কোন জন্তু না থাকলে জন্তুর ব্যবস্থা করতে হবে।"

মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার এই নিশ্চয়তা প্রদান ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। কেননা রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই ইহা প্রসারিত ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের যে কোন ধরনের সেবায় যে-ই আত্মনিয়োগ করুক না কেন সে-ই এই সুবিধা ভোগের হকদার। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র যখন উহার কর্মচারীদেরকে এই সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন সমাজের অন্যান্য সকলের জন্যেও এরূপ সুবিধা প্রদান উহার আবশ্যক কর্তব্য হয়ে দাঁড়াৎয়। এ কারণেই যারা বার্ধক্য, অসুস্থতা, বিকলাংগতা বা বয়স কম হওয়ার কারণে উপার্জন করতে অক্ষম, ইসলামী রাষ্ট্র সরকারী কোষাগার থেকে তাদের যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে যাদের আয়ের উৎস খুই সীমিত তথা প্রয়োজনের তুলনায় কম তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য প্রদানের দায়িত্বও ইসলামী সরকার গ্রহণ করে।

অতএব প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্র উহার সকল নাগরিকের জীবন-যাপনের জন্যে যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূর্ণ করার সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে ইসলাম যে কর্মপদ্ধতি অনুসরণকর তা তেমন লক্ষ্যণীয় নয়; লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ইসলামী রাষ্ট্রের এই মূলনীতি যে, গোটা জাতির লাভ ও লোকসানে সকল ব্যক্তিকে সমানভাবে অংশীদার সাব্যস্ত করা। এতে করে কর্মচারী ও শ্রমিকরা শুধু যে অন্যদের শোষণ থেকেই বেঁচে যায় তা-ই নয়, বরং সুখী, সমৃদ্ধ ও সম্মানজনক জীবনযাপন করতেও সমর্থ হয়।

আজকের 'সভ্য' (!) পাশ্চাত্য জগতে পুঁজিবাদের যে জঘন্য রূপ ফুটে উঠেছে ইসলামী অনুশাসনের আওতায় উহা কখনো সৃষ্টিই হতে পারে না। ইসলামী শরীয়তের কোন আইন –চাই উহা আইন প্রণেতার নিকট থেকে সরাসরি গ্রহণ করা হোক কিংবা পরবর্তী সময়ে

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়তের গণ্ডিতে থেকে 'ইজতিহাদ' –এর মাধ্যমে রচনা করা হোক –পুঁজিপতিদেরকে এরূপ অনুমতি দেয় না যে, শ্রমিকদেরকে বঞ্চিত করে নিজেরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলবে। ইসলামী পুঁজিবাদের অন্যান্য অভিশাপও- মেযন উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ, গোলাম প্রভৃতি –অঙ্কুরিত হতে পারে না।

একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলাম শুধু ভালো ভালো আইন-কানুন উপহার দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করে না; বরং সাথে সাথে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নিকটও আবেদন জানায় যাকে কমিউনিস্টরা শুধু এ কারণে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যে, ইউরোপের ইতিহাসে উহার বাস্তব কার্যকারিতার কোন নিদর্শন বর্তমান নেই। ইসলামের মতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ মানুষের বাস্তব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ। এদিক থেকে ইসলাম একটি অদ্বিতীয় জীবন পদ্ধতি। উহা আত্মার পবিত্রতা ও সামাজিক শৃংখলাকে একটি পারস্পরিক মজবুত সম্পর্কে আবদ্ধ করে দেয়। উহা সমাজকে যেমন গুরুত্বহীন মনে করে না, তেমনি ব্যক্তিকেও বল্গাহীনভাবে ভেড়ে দেয় না। এরূপ করলে চিন্তা ও আচরণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা উহার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর হতো না। ইসলামী আইন-কানুন নৈতিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। এ কারণেই ইসলামে আইন ও নৈতিকতার মধ্যে কোন বিরোধিতা বা সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় না; বরং একটি আরেকটির সাথে সামঞ্জস্যশীল, একটিতে কোন অল্পতা দেখা দিলে অন্যটির দ্বারা তা পূর্ণ করা হচ্ছে; তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা পারস্পরিক বিরোধিতার কোন অবকাশ নেই।

বিলাসিতা ও অপব্যয় সীমিতকরণ

দেশের সম্পদক কতিপয় লোকের কুক্ষিগত হওয়ার অনিবার্য ফলস্বরূপ যে বিলাসিতা, আমোদদ-প্রমোদ ও যথেচ্ছাচারিতার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় ইসলামী নৈতিকতার দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণরূপেই অবৈধ। ইসলাম উহাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। উহা সম্পদশালীদেরকে নির্দেশ দেয়: তারা যেন কর্মচারী ও শ্রমিকদের উপর বে-ইনসাফী না করে, তাদের পারিশ্রমিক যেন কম না দেয়। তাদের প্রাপ্য যেন পুরোপুরি পরিশোধ করে। কর্মচারীদের উপর জুলূম ও নির্যাতনের আরেকটি রূপ হলো সম্পদ সঞ্চয়। এ কারণে বে-ইনসাফী নির্মূল করার উদ্দেশ্যে এরূপ সঞ্চয়কেও বন্ধ করে দেয়া অপরিহার্য। বস্তুত ইসলাম তাই সম্পদ সঞ্চয় করে রাখার ঘোর বিরোধী। ইসলাম মানুষের মনে আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করার এমন প্রেরণা যোজায় যে, সে তার সবকিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করে দিতে পারে। যে সমাজে সচ্ছল ব্যক্তিরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে অন্য ব্যক্তিদের জন্যে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত হয় সেখানে দরিদ্রতা ও বঞ্চনা বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারে না। কেননা এর উভয়টিই হীন স্বার্থপরতার অনিবার্য ফসল; আর এই স্বার্থপরতার কারণেই ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদ ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জন্যে ব্যয় করে ফেলে।

আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য

ইসলাম মানুষের যে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করে দেয় তাতে করে সে আল্লাহর নৈটক্যলাভ করতে সমর্থ হয়। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতের পুরস্কার লাভের আশায় সে স্বেচ্ছায় দুনিয়ার সমস্ত আরাম-আয়েশ ও সুযোগ-সুবিধা হাসিমুখে বর্জন করতে পারে। বস্তুত এই প্রকার মানুষ যারা আল্লাহকে পেলেই খুশী হয় এবং আখেরাতের সুখ-দুঃখের উপর আস্থাশীল তারা –কখনো সম্পদ সঞ্চয়ের ব্যধিতে আক্রান্ত হতে পারে না এবং স্বীয় স্বার্থের জন্যে অন্যের উপর জুলূম-নির্যাতন ও অযথা শোষণ চালাতে পারে না।

আইনের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুসরণ

ইসলাম মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির যে সোপানে পৌঁছিয়ে দেয় তাতে করে যে অর্থণৈতিক বিধি-বিধান পুঁজিবাদের ধ্বংসাত্মক দিকগুলোকে নির্মূল করে দেয় তার অনুসরণ করা একেবারেই সহজ হয়ে যায়। বস্তুত ইসলামী সমাজে যখন এই বিধি-বিধান প্রবর্তন করা হয় তখন সকল মানুষই স্বেচ্ছায় ও পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে উহা পালন করতে থাকে। কোন শাস্তির ভয়ে নয়, বরং নৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই আইন অনুসরণ করতে থাকে। কেননা মনে প্রাণে যা সে কামনা করে আইনের দাবীও তা-ই।

শেষ কথা

পরিশেষেও একথা পরিষ্কার ভাষায় বলা প্রয়োজন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে ঘৃণিত ও কদর্য রূপ আজকাল ইসলামী দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করেছে, ইসলামী ব্যবস্থার সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। এ কারণে তার ধ্বংসাত্মক দিকগুলোর জন্যে কস্মিনকালেও ইসলামকে দায়ী করা যায় না।